ষড়বিংশ বর্ষ । বইমেলা ১৪০০

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ রচিত গ্রন্থাবলী :

বাংলার অন্যতম লোক-সঙ্গীত কবিগান ও কবিয়ালদের সম্পর্কে জানা ও গবেষণার পক্ষে অপরিহার্য

পূর্ববঙ্গের কবিয়াল কবি-সঙ্গীত ৫০·০০

পূর্ববঙ্গের কবিগান ৯০·০০

(কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত)

[পূর্ববঙ্গের আটটি জেলার আশিজন কবিয়ালের জীবনকাহিনী ও তিন শতাধিক কবিয়ালের নামধাম, দুষ্প্রাপ্য ফটোগ্রাফ, বিভিন্ন ধরনের কবিগান ও জবাব, কবির আসর ও লড়াই'র বিচিত্র বর্ণনা সম্বলিত দুই খণ্ডে ৮০০ পৃষ্ঠায় বিধৃত সুবৃহৎ গ্রন্থ—কবিগানের আকর বিশেষ।]

নকুলেশ্বর গীতিমাল্য ২৫·০০

[সব কবিয়ালই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। কবিয়ালদের মধ্যে বিরল ব্যতিক্রম কবিগানের স্বর্ণযুগের শেষ প্রতিনিধি বরিশাল-ঝালকাটির নকুলেশ্বর সরকার রচিত সঙ্গীত-সম্ভার।]

পরিবেশক : দে বুক স্টোর, ১৩, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩

ভারত ভাগের বীজবপন এবং গান্ধীজীর স্বপ্ন ও সাধনার সমাধিক্ষেত্র—

নোয়াখালির মাটি ও মানুষ ৫০·০০

জ্ঞান প্রকাশন

২৩/১ কলেজ রো, কলিকাতা-৯

মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা প্রসারের উদগাতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নব রূপকার

আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের শিক্ষাচিন্তা ৭৫·০০

ডঃ দীনেশচন্দ্র সিংহ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত

কৃশানু
ষড়বিংশ বর্ষ ॥ দ্বিতীয় সংখ্যা ॥ মাঘ-চৈত্র ১৪০০

সম্পাদকীয়

কবিতা লিখেছেন

জহর পান ২ । মনন দাশ ১১ । তপন চক্রবর্তী ১১ । শিশির গুহ ১২ । রবীন কর ১২ । শঙ্কর বাগ ১৩ । শান্ত হাজরা ১৫ । অজিত বসু ১৫ । দুলাল সমাদ্দার ১৬ । শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায় ১৬ । সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায় ১৭ । অচিন্ত্য বিশ্বাস ১৮ । বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায় ১৯ । অনুপকুমার আচার্য ২০ । অমিয়কুমার সেনগুপ্ত ২০ । নিরঞ্জন বিলাস ২১ । অমলেন্দু দত্ত ২১ । অঞ্জন মজুমদার ২২

রম্য হলেও সত্যি

শক্তিদুলাল দত্ত—কাজির বিচার ২৩। প্রতাপকুমার রায়—আমার ছাবেব ২৯

পুস্তক সমালোচনা

অনুপকুমার আচার্য ৩৩

প্রচ্ছদ—মনন দাশ
সম্পাদক—দীনেশচন্দ্র সিংহ

কৃশানু

সংবাদপত্র রেজিষ্ট্রেশন (কেন্দ্রীয়) বিধির ৮নং ধারানুযায়ী বিজ্ঞপ্তি—

১। প্রকাশের স্থান—৩০/১এ, কলেজ রো, কলিকাতা-৯

২। প্রকাশের কাল—ত্রৈমাসিক

৩। প্রকাশক ও মুদ্রকের নাম---শ্রীমদন দাশ, জাতীয়তা—ভারতীয় ঠিকানা—৬০/২, ব্যানার্জী বাগান লেন, হাওড়া ৬

৪। সম্পাদকের নাম—শ্রীদীনেশচন্দ্র সিংহ, জাতীয়তা—ভারতীয় ঠিকানা:—গ্রাঃ+পোঃ—দৌলতপুর, জিলা—২৪ পরগণা (দঃ)

৫। মালিকগণের নাম ও ঠিকানা : (ক) মদন দাশ, ৬০/২ ব্যানার্জী বাগান লেন, হাওড়া-৬। (খ) দীনেশচন্দ্র সিংহ, দৌলতপুর, ২৪ পরগণা। (গ) মলিন দত্ত, রামকৃষ্ণ পল্লী, বাটানগর, ২৪ পরগণা। (ঘ) হরিপ্রসাদ ভৌমিক, ই, এইচ ১/২১, বাটানগর, ২৪ পরগণা।

আমি, মদন দাশ এতদ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উপরোক্ত বিবরণ আমার জ্ঞান ও বিশ্বাসমতে সত্য। স্বাক্ষর—মদন দাশ

তারিখ ১লা ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৪ প্রকাশক

MAMONI STORES

Prop. Sk. SAHAJAN ALI

Chatta Chalki Para, P. S. Maheshtala
Dist. 24 Paraganas (South)

BEST MATERIALS AVAILABLE
FOR USING IN
GARMENT INDUSTRY

Cheap & Best means
'MAMONI STORES'

MONDAL MEDICAL

Prop. Mr. MARUF MONDAL

Chatta Chalkipara, P. S. Maheshtala
24 Parganas (South)

RELIABLE DRUGS FOR
WHOLE DAY & NIGHT

Special facilities given for patients in need
by the Specialist Physicians
FREE !

NO CHARGE TAKEN FOR PUSHING OF INJECTION.

পশ্চিমবঙ্গ নাট্য আকাদেমির বই

সফদর হাশমি নাটা সংগ্রহ		১৫·০০ টাকা
ঋষি-নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য	কুমার রায়	২·০০ টাকা
কলকাতার নাট্যচর্চা	রথীন চক্রবর্তী	১০০·০০ টাকা
নট ও নাট্যকার যোগেশচন্দ্র চৌধুরী,	কুমার রায়	৩·০০ টাকা
সুকুমারী দত্ত ও অপূর্বসতী নাটক		
সম্পাদনা	বিজিতকুমার দত্ত	৮·০০ টাকা
নাট্য আকাদেমি পত্রিকা তৃতীয় সংখ্যা		২০·০০ টাকা

সদ্য প্রকাশিত

নট-নাট্যকার নির্দেশক		
বিজন ভট্টাচার্য	লেখা সজল রায়চৌধুরী	
সম্পাদনা	নৃপেন্দ্র সাহা	৮০·০০ টাকা
নাট্যাচার্য শিশির কুমার	শঙ্কর ভট্টাচার্য	৪০·০০ টাকা
আশার ছলনে ভুলি	উৎপল দত্ত	৩৫·০০ টাকা

॥ প্রাপ্তিস্থান ॥

নাট্য আকাদেমি দপ্তর—কলকাতা তথ্য কেন্দ্র
১/১ আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু রোড কলকাতা-৭০০ ০২০,
টেলিফোন-২৪৮-৪২১৪
ইউনিভারসিটি ইন্সটিটিউট হল কাউন্টার, কলেজ স্কোয়ার,
কলকাতা-৭০০ ০৭৩
ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩, দে বুক এজেন্সি,
কলকাতা-৭০০ ০০৩ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি গ্রন্থাগার, ১১৮
হেমচন্দ্র নস্কর রোড, কলকাতা-৭০০ ০১০

With best compliments from :

PHONE : Office—25-4636
25-7493
S. Room—25-0046

NATIONAL CABLE INDUSTRIES
DELHI

Distributors :

R. L. KANHAYA LAL (SALES)

32, EZRA STREET,
2nd Floor, Room No. 263
S. R. 53, ERRA STREET,
CALCUTTA-700 001.

সর্বনাশা কালীদাসী বুদ্ধি

সাম্প্রতিককালে ভারতীয় হিন্দুদের হিতোপদেশ দান মনুষ্যসমাজে বুদ্ধিজীবী নামে যে একজাতীয় নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে—তাদের একচেটিয়া পেশা এবং পৈতৃকসূত্রে প্রাপ্ত অধিকার হয়ে দাঁড়িয়েছে দেখা যায়। সদ্যসমাপ্ত কলিকাতা পুস্তক মেলায় "অশোককুমার স্মৃতি" বক্তৃতায় প্রখ্যাত সাংবাদিক খুশবন্ত সিংও হিন্দুদের প্রতি একপ্রস্থ প্রাণবন্ত উপদেশ বর্ষণ করেছেন। আমরা সর্দারজীর উপদেশাবলীর তাৎপর্য পর্যায়ক্রমে বিশ্লেষণ করছি :—

(ক) "ভারতের জন্য চাই এক নতুন ধর্ম। আমাদের এখন উদ্দেশ্য হোক—কাজই পূজা, পূজা কিন্তু কাজ নয়।"—আমরা বলি, সর্দারজী শুধু পূজার কথাই বললেন, যেহেতু হিন্দুরাই শুধু পূজা করে; তিনি কিন্তু নামাজ, প্রেয়ার, পাঠ, উপাসনা প্রভৃতি অন্যান্য সম্প্রদায় আচরিত ধর্মীয় রীতি ও প্রথার কথা এড়িয়ে গেলেন।

(খ) "বিয়ের সময় হোমাগ্নি কিংবা গ্রন্থসাহেবের সামনে দম্পতিরা শপথ নিন, প্রথম সন্তান জন্মানোর পরেই তারা বন্ধ্যাকরণ করিয়ে নেবেন।"—তা এই বিধান তো তিনি হিন্দু-শিখের জন্যই ধার্য করলেন। দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম সম্প্রদায় সম্পর্কে তিনি নীরব কেন? হোমাগ্নি ও গ্রন্থসাহেবের সঙ্গে কোরাণ শরিফের উল্লেখ সর্বধর্মে সমভাব এবং সর্বধর্ম সমন্বয়ের দারুণ লাবড়া হতো। কিন্তু কোরাণের নামোচ্চারণে তাঁর সাহস নেই কেন? এটা কি ইচ্ছাকৃত বিস্মৃতি; নাকি সংখ্যা-লঘু সেন্টিমেন্টে সুড়সুড়ি দানের ভীতি?

(গ) "কন্যাপণের সঙ্গে যেন কিছু কনডোম দিয়ে দেওয়া হয়।" কনডোম ব্যবহারের উপদেশ যারা ন্যানুভম্ প্রজনন করে যাচ্ছে, তাদের প্রতি দান করলেই যথার্থ দেশব্রতীর কাজ হতো না কি?

(ঘ) "বন সম্পদ সংরক্ষণের স্বার্থে মৃত্যুর পরে শবদাহ নিষিদ্ধ করতে হবে।"—হিন্দুরা তো বহুদিন আগেই বৈদ্যুতিক চুল্লিতে শবদাহ ব্যবস্থা মেনে নিয়েছে। এক চুল্লিতে লক্ষ লক্ষ মরদেহের সৎকার হচ্ছে। বড় বড় শ্মশানে কাঠের চুল্লি প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। কিন্তু অপরদিকে কবরে কবরে যে মহামূল্যবান জায়গা জমি ছয়লাপ করে চলেছে। উপদেশের চোদ্দাটা সেদিকে ঘুরিয়ে বলতে সর্দারজীর সাহস নেই কেন?

(ঙ) "দাহের বদলে কবর দেওয়া আবশ্যিক করতে হবে, আর জায়গা বাঁচানোর জন্য শবদেহ কবর দিতে হবে দাঁড় করিয়ে।"—এই প্রথাটা যারা এখন

শুইয়ে কবর দেয় তাদের প্রতিও প্রযোজ্য কিনা তা সর্দারজী খোলসা করে বলেননি। তাঁর কথার ধরনে তা কিন্তু মনে হয় না। হিন্দুদের কাছে অবশ্য শ্মশানের জ্বালা আর কবরের শান্তি উভয়ই সমান ; কারণ—

প্রাণপাখি গেলে উড়ে,
শবদেহ থাকে পড়ে,
তারে গাড়ে পোড়ে দেয় কবরে,
মরার আর ভালমন্দ কি ?

তার শোয়া চিৎ উবুতে কিছু যায় আসে না ; কিন্তু অপরপক্ষ তা মানবে কি ?

(৮) "কবরের উপর স্মৃতিসৌধ না তুলে তার উপর গাছ পুতুন। দশটি গাছ পোতা হোক পৈতের সময়, আর দশটি গাছ লাগানো হোক ছেলেমেয়ে যখন স্কুল থেকে পাশ করে বেরোবে, সেই সময়। বিয়ের সময়ের জন্য খুশবন্ত নির্ধারণ করেছেন কুড়িটি বৃক্ষরোপন।"—এসব কথা শুনতেও ভাল, আর ভাবতে আরো ভাল লাগে। খুশবন্ত যদি পৈতের সঙ্গে সুন্নতের উল্লেখ করতেন তাহলে আরো খুসী হতাম। যারা এক বৌ, এক সন্তানের সংসারী তাদের দ্বারা আর কয়টা গাছ পোতা হবে। যারা বৌ-বাচ্চার আর ছাওয়াল-পট্টি নিয়ে সংসার করে, তারা যদি সর্দারজীর হিতোপদেশ মেনে চলে তবে ভারতভূমির জনস্থল গভীর বনস্থলে রূপান্তরিত হতে বেশীদিন লাগবে না।

(৯) "বেছে বেছে আমিষ আহারের কোনও মানে হয় না····যদি খাদ্য তালিকায় কোন পশুমাংস থাকে, তাহলে সুখাদ্য সব মাংসই আহার করুন।"—অর্থাৎ কথার প্যাঁচে তিনি হিন্দুদের গোমাংস খেতে সুপরামর্শ দিচ্ছেন। হিন্দুরা তো সংস্কার-বিরোধী মাংসও আজকাল গো-গ্রাসে গিলছে। মুরগীর মাংস বিয়ে পৈতে অন্নপ্রাশনে পরিবেশন হচ্ছে। কলিকাতার বিখ্যাত গো-গোস্ত পরিবেশক হোটেল রেস্তোরাঁগুলির আশী শতাংশ খদ্দের তো হিন্দু। তাহলে ঐক্য ও সংহতির স্বার্থে শূকর ও কচ্ছপের মাংসের সর্বজনীন ভক্ষণ খুশবন্তজী সুপারিশ করছেন কি ? সেও তো কম সুস্বাদু নয়।

একথা জোরের সঙ্গে বলা যায় যে খুশবন্তজীর মতো সময়য়ওয়ালার হিতোপ-দেশের অপেক্ষা না করেই হিন্দুরা সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে তাল রেখে সামাজিক রীতিনীতি ও ধর্মীয় ক্রিয়াকাণ্ডে যেসব সংস্কার ত্যাগ করেছে, অন্য যে কোন ধর্মীয় সম্প্রদায় সেরূপ পরিবর্তন কার্যে রূপদান তো দূরের কথা, চিন্তাও করতে পারছে না। একে একে সেসব উল্লেখ করা যেতে পারে :—

(১) বহু হিন্দু ত্রি-সন্ধ্যা আহ্নিক ছেড়েছে। কুলগুরু ত্যাগ করেছে। ব্রাহ্মণরা পৈতা টিকি ছেড়েছে।

(২) হিন্দু পূজানুষ্ঠান থেকে বলিদান প্রথা প্রায় উচ্ছেদ হয়েছে। একমাত্র পীঠস্থানগুলিতে তা নামমাত্র বজায় আছে। অপরপক্ষে কোরবানিতে আড়াই-পৌচি গরুর গোঙানি ও ছটফটানির হৃদয়বিদারক এবং অসহনীয় দৃশ্য হিন্দুরা অহরহ প্রত্যক্ষ করছে।

(৩) অনেক হিন্দু পিতামাতার দেহাবসানে পারলৌকিক ক্রিয়াদি—কাছা ধারণ, হবিষ্য পালন, মস্তক মুণ্ডন ও শ্রাদ্ধাদিকার্য পরিত্যাগ করেছে।

(৪) শালগ্রাম শিলা সাক্ষী রেখে ব্রাহ্মণ পুরোহিত কর্তৃক সম্পাদিত বিবাহানুষ্ঠান ত্যাগ করে অনেক হিন্দু রেজিষ্ট্রি অফিসে সীলমোহর মারা বিয়ে করছে। কেউবা সামাজিক রীতি ও সংস্কার সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে আদিম নরনারীর মতো 'লিভিং টুগেদার' জাতীয় জীবনযাপন করছে।

(৫) একের অধিক বিবাহ তো হিন্দুদের পক্ষে আইনতঃ নিষিদ্ধ; কিন্তু অপরপক্ষ ক্রমাগত বিবাহ ও অবিরত সন্তানোৎপাদনের লাইসেন্স পেয়েছে ধর্মীয় নির্দেশের দোহাই দিয়ে।

(৬) বিচ্ছেদ যন্ত্রণায় অনেকে কাতর হন শুনেছি; কিন্তু নিতান্ত বাধ্য হয়ে যেসব হিন্দু বিবাহ-বিচ্ছেদ কামনা করেন তা পাওয়া যে কি যন্ত্রণাদায়ক তা ভুক্তভোগী মাত্রই জানেন।

(৭) হিন্দুরা ধুতি ছেড়েছে, লুঙ্গী ধরেছে, কিন্তু অপরপক্ষের ঘাটো পা-জামা, চাপা টুপী ও বিভিন্ন ধাঁচের মোচ-দাড়ির বহর দেখলে ১৯৪৬-এর দিনগুলি ফিরে এসেছে মনে হয়।

(৮) একপক্ষ ধর্ম সংস্কারের মূলে কুঠারাঘাত করে ঐক্য ও সংহতির পরাকাষ্ঠা দেখাচ্ছে, অপরপক্ষে সময় নেই অসময় নেই পাঁচ ওয়াক্ত যান্ত্রিক নামাজের আওয়াজে শব্দদূষণ করছে।

(৯) মধ্যবিত্ত হিন্দুপাড়ায় পরিবার পরিকল্পনার দৌলতে শিশুর কান্না ও কচি কণ্ঠের কলকাকলি প্রায় শোনা যায় না; পাড়াকে পাড়া খোঁজা ও বাজায় গিজগিজ করছে; অপরপক্ষে পাড়া-বেপাড়া, স্টেশন প্ল্যাটফর্মে, ফুটপাথে, ব্রিজের তলায়, রেল লাইনের পাশে, ড্রেন পাইপের ভিতরে কচুরিপানার মতো বংশবৃদ্ধিতে চারদিক উপচে পড়ছে।

(১০) বিভিন্ন হিন্দু মঠ মন্দির মিশন, আশ্রম আখড়া সঙ্ঘ গুরুধাম—এমনকি সমাজ জীবনের নানা ক্ষেত্রে শত সহস্র চিরকুমার কুমারী দেখা যায়। সাধু-সন্তদের তো কথাই নেই। অন্য সম্প্রদায়ে একজন চিরকুমার বা কুমারী তো অতীব আশ্চর্যের বিষয়। সেখানে ধর্মীয় নেতা ও হুজুরদের

সত্তর বা তদূর্ধ্ব বয়সে ষোড়শী নিকা এবং তজ্জনাধিক বান্দা পয়দা না হলে নাকি বেহেস্তের পথ প্রশস্ত হয় না।

(১১) ছাত্রাভাবে হিন্দুপাড়ার প্রাইমারী স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যাচ্ছে; ওদিকে প্রতিবেশী পাড়ার প্রাইমারী স্কুলে 'ঠাঁই, ঠাঁই নেই ছোট এ তরী' অবস্থা।

(১২) নূতন মন্দির নির্মাণে অর্থব্যয় যে অকারণ অপব্যয় তা হিন্দুদের শতরূপে শতবার বোঝান হচ্ছে; অপরপক্ষে নতুন নতুন মসজিদের জেল্লা ও রমরমা, পুরনো মসজিদগুলির পাশে দিয়ে ও উচ্চতায় বৃদ্ধির বহর দেখলে কে বা কারা এসবের রসদ জোগায় সে চিন্তা মনে জাগে। অথচ মোরো বাস্তর মাঝে সুরম্য মসজিদ সামাজিক মানসিকতারই প্রতিফলন।

(১৩) ভারতের আদি-বাসিন্দা হিন্দুরা বিদেশী মুসলিম শাসকদের কাছে ছিল ঘৃণিত কাফের। ইংরেজরা বেসরকারীভাবে হিন্দুদের 'Heathen' বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করতো; আর সরকারী পর্যায়ে হিন্দুরা ছিল 'জেনায়েন' বা non-Muslim (অমুসলমান) নামে চিহ্নিত। অধুনা বাংলাদেশে হিন্দুদের নতুন নামকরণ হয়েছে 'মালাউন' বলে। আর স্বদেশী শাসনে ভারতবাসী হিন্দুদের জাতিগত বৈশিষ্ট্য ভুলিয়ে "সেকুলারিস্ট" বানাবার জন্য সমন্বয়ওয়ালারা ডলার-জল খেয়ে কোমর বেঁধেছে।

(১৪) যারা পয়দা থেকে এস্তেকাল অবধি সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা ও ধর্মীয় অসহিষ্ণুতার একনিষ্ঠ খিদমদ্গার, তারা বা তাদের টনীরাই এখন ধর্ম সম্পর্কে নিস্পৃহ উদাসীন ও সহনশীল হিন্দুদের উদারতা ও পরমত সহিষ্ণুতার মাহাত্ম্য শোনাতে আসছে—কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?

ইদানীং কোন কোন সমন্বয়ওয়ালা—যাদের বেশীরভাগ কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের "লে লে বাবু সাড়ে ছে আনা দরের অধ্যা-পোক, কেউবা আজকাল মোল্লাবাজারের মতো প্রতিষ্ঠানের বাঁধা মাইনের চাকুরীর সঙ্গে বিদেশী রাষ্ট্রের শুঁড়িখানায় বাঁধাধরা হাজিরা দিয়ে থাকেন এবং জীবনে পুরুষ-পরিবর্তন পটিয়সী কিছু মহিলা সম্প্রদায় বিশেষের জীবনভর তালাক-নিকে খেলা, একসঙ্গে চার বিবির সঙ্গে সহবাস, মামাত চাচাত বোনকে সাদি করা, কম্পিটিশনে বংশবৃদ্ধি প্রভৃতি আচরণের মধ্যেও প্রগতিশীলতার ছাপ দেখতে পান। কারণ, এসব ব্যাপারে তাঁরা কখনো চোপা খোলেন না। এদের বিকৃত বিবেকবুদ্ধি তো হিন্দুদের স্বার্থহানি করার জন্যই দেশী-বিদেশী বিধর্মীর কাছে ডলার দামে বিক্রিত।

দেশ ও জাতির সর্বনাশ হোক, তা বলে অন্নপালের বংশধরগণ তো ডলার-হারামি করতে পারেন না।

তসলিমা নাসরিন / জহর পান

তসলিমা নাসরিন। তসলিমা নাসরিন !!
বাঙালী হিন্দু পারবে না শোধিতে জীবনে তোমার ঋণ।
ছে'চল্লিশ থেকে সাতচল্লিশ বছরের নিরুদ্ধ প্রাণের ব্যথা,
তোমার কলমে পেয়েছে প্রকাশ সে সব অকথিত কথা।
শিক্ষা দীক্ষা জ্ঞানবিজ্ঞানে সেরা ছিল যারা সারা দেশে,
বেশীর ভাগ তাদের জন্মেছিলেন অধুনা বাংলাদেশে।
কত বিপ্লবী দেশপ্রেমিক ধনিক বণিকের নাই সংখ্যা,
স্বাধীনতা সংগ্রামে শহরে ও গ্রামে বাজায়েছে রণডঙ্কা।
জেল কি ফাঁসীতে লাঠি ও গুলিতে করিতে পারেনি স্তব্ধ,
অত্যাচারীর কণ্ঠ নীরব করেছে 'বন্দে মাতরম্' শব্দ।
ফাঁসীর মঞ্চে গেয়ে গেছে তারা জীবনের জয়গান,
দেশমাতৃকার শৃঙ্খল মোচনে করেছে জীবনদান।
স্বাধীনতা-সমুদ্র মন্থনকালে উথলিল গরল-সিন্ধু,
সেব বিন্দুতক পান করল তার পাকিস্তানের হিন্দু।
ক্রুর সাম্প্রদায়িকতার বলি হল তারা হারাল ঘরবাড়ি,
হিংস্র-লোলুপ প্রতিবেশীর হস্ত নিয়েছে সমস্ত কাড়ি।
শত সহস্র সোনার সংসার সব পুড়ে হল ছাই,
মহন্ত সমাজ ছাড়িয়া মানুষ জঙ্গলে নিয়েছে ঠাঁই।
সোনার বাংলার শ্যামল ক্রোড়ে বাস হল ঘোর বিপদ,
আন্দামান দণ্ডকারণ্যের জঙ্গল তার চেয়ে নিরাপদ।
লাখে লাখে ঝাঁকে ঝাঁকে ছেড়ে এসেছে পূর্ব পাকিস্তান,
যারা র'ল দেশে বুক বেঁধে আশে, বাংলাদেশে বাঁচবে মান।

সকল আশা হয়েছে বিলীন স্বপ্নভঙ্গ কালরাত্রি শেষে,
পাকিস্তানী আমল হার মেনেছে ইসলামী বাংলাদেশে।
জাতীয় পোষাক ধুতি চাদর নেই পরনে বাঙালী হিন্দুর,
হিন্দুর মেয়েরা পরিতে পারে না এয়োতির চিহ্ন সিন্দুর।
মঠ মন্দিরে বাজায় না শাঁখ পরে না শাখা হিন্দু নারী,
কণ্ঠে ফোটে না উলুধ্বনি, শুনিলে যে দেয় টিটকারি।

দশম বছরে পা দিলে মেয়েটি, ভেবে মরে পিতা মাতা,
দিশাহারা ভয়ে রাখিবে লুকায়ে, স্নেহের কন্যারে কোথা।
ছিনিয়ে তারে নিয়ে যায় ধরে রাতের আঁধারে দিবালোকে,
নীরব অশ্রু ঝরে পিতামাতার অপহৃতা কন্যার শোকে।
ধর্মে আঘাত মর্মে আঘাত করে চলেছে অবিরত,
হিন্দুর জন্য দরদী বন্ধু, আইন কিংবা আদালত।
লাঞ্ছনা গঞ্জনা হিংসা ও ঘৃণা পদে পদে পদাঘাত,
তার মাঝে করে বাংলাদেশী হিন্দু পঞ্চদশ দিনপাত।
বিংশ শতকের মধ্যপাদ থেকে শেষ পাদ অবধি,
মা আর মেয়ের কাঁদনে গাছের পাতা ঝরে নিরবধি।
সবই যাদের ছিল এককালে আজ তারা সর্বহারা,
সমন্বয়বাদী দেখে এলো ইসলামী শাসনের চেহারা।
ঘরের নারী ভয়ে মরে ঘরে, মানইজ্জত থাকে না বাইরে,
হিন্দুর দোকানপাট হয়ে যায় লোপাট আল্লা-হু-আকবরে।
প্যালেষ্টাইন দক্ষিণ-আফ্রিকার জন্য সহানুভূতির ঢেউ,
বাংলাদেশী হিন্দুর দুর্গতি দেখেও দেখে না রে কেউ।
বর্ণ-বৈষম্যে সবাই বিচলিত, সবাই চায় তার প্রতিকার,
ধর্ম-বৈষম্যের শিকারের জন্য সময় কই মাথা ঘামাবার।
কোথা এমনেস্টি, কোথা মানবাধিকার, কোথা বা ইউনো,
কান পেতে তোমরা সকলে একবার হিন্দুর কান্না শোনো।
যে নীরব অশ্রু ঝরিছে গত পঞ্চাশ বৎসর ধরে,
কখনো তা করেনি প্রবেশ তোমাদের কর্ণকুহরে।
পশ্চিমবঙ্গের বুদ্ধিজীবীর দল ঢাকা শহরে গিয়ে,
আতিথেয়তার চোঁয়া ঢেকুর তোলে গোস্ত-পরোটা খেয়ে।
আমদানী বগলে, গোগ্রাসে গিলে, সংহতির কাটে আবর,
বারেকের তরে নেয় না তারা বাংলাদেশী হিন্দুর খবর।
কবি সাংবাদিক কিংবা রাজনীতিক, নেতা কিংবা হোতা,
বাঙালী হিন্দুর ব্যথা প্রকাশিতে সবারই কলম ভোঁতা।
ওপার বাংলার মুসলমান কিংবা এপারের হিন্দু জাত,
পূর্ববঙ্গের হিন্দুর জন্য করে নি একবিন্দু অশ্রুপাত।
আঁধারের মাঝে আলোর নিশানা দেখাল তোমার কলম,
লজ্জাহীন বজ্জাতের দলে তাতেও কি পেয়েছে সরম।
ঘোমটার আড়ালে খেমটা নাচে, ঐক্য সংহতির ধুম,
তোমার 'লজ্জা' খুলেছে মুখোস, কেড়েছে তাদের ঘুম।
দানবের মাঝে তুমি মানবী, অসুরের মাঝে দেবী নাসরিন।
বাংলাদেশী হিন্দু রাখবে স্মরণ চিরদিন তোমার ঋণ।।

তবু কিছু কথা থাকে / মনন দাশ

তবু কিছু কথা থাকে,
ঘাসবনে হারিয়ে যাওয়া প্রিয় নাকছাবির মতন,
জড়োয়া গহনায় সেজে মুকুরের মুখোমুখি হ'লে
কেঁপে ওঠে প্রতিবিম্ব, আনমনা তর্জনী ছুঁতে চায়
হারিয়ে যাওয়া তুচ্ছ অলঙ্কার,
চকিত ঝিলিক দিয়ে সুপ্ত রশ্মিগুলি
ফিরে ফিরে আসে পুনর্বার।

শীতের কুণ্ঠিত বেলায় খসে যায় বৃক্ষদের জীর্ণ বেশবাস
বৃক্ষ কি মনে রাখে জীর্ণ চিরবাসের হিসাব ?
তবু কিছু কথা থাকে শুষ্ক ঝরাপাতার মর্মরে
নবপত্র সজ্জাভারে সাজার বেলায়
সে কথা শিহর তুলে যায়।

সমুদ্র রক্তিম সূর্যাস্ত বেলায়···
সারাদিন আকাশের নীল রঙ মেখে
সন্ধ্যায় প্রত্যাবের অনুরাগ স্মৃতি···

অস্তাচল / তপন চক্রবর্তী

আমার দু'পাশে প্রতিনিয়ত যারা চলাফেরা করে
আড়ালে আবডালে তাদের ডেকে বলি :

এইখানে একদিন সূর্যাস্ত হবে
এইখানে একদিন শরীরসঙ্গহীন দেহভাষা খুঁজে পাবে
এইখানে একদিন আনন্দমুখর সত্তা বটবৃক্ষ হবে
এইখানে একদিন বিষন্নের বুক চিরে আনন্দচল বয়ে যাবে

তোমরা যারা বাধাবন্ধহীন নেমে আছো জলে
পথ করে দাও সিংহাসনের রাজা যাবেন অস্তাচলে।

আমার জন্য বরাদ্দ / শিশির গুহ

বন্ধুগণ, নমস্কার
আজ একটু সুখ-দুঃখের কথা বলি কেমন।
অনেক ভেবে দেখলাম, প্যাঁচ-পয়জার কষতে না শিখলে
কিছুই হবার নয়। আর সে জন্যেই আমি চিরকাল লাইব্যান
এ জীবনে সামাদ, চুনী, গাভাসকার হওয়া আর হোল না।

একবার মতি শীল কলেজের পাশে এক অনুষ্ঠানে
সবার জন্য বরাদ্দ ছিল দুটো করে থিন এরারুট বিস্কুট,
বাপ-মা'র নাম না জানা কয়েকটা ন্যাংটো শিশু
বিস্কুট চাইতেই এক মাতব্বর তাড়িয়ে দিলেন সবাইকে
অনুষ্ঠানের শেষে চুপিসাড়ে দু' প্যাকেট দিয়ে
বল্লেন—চায়ের সাথে খেও, দিন সাতেক চলে যাবে।

আহা, সবাই কেন এমন করে আমাকে সন্টুশেকে
বাড়ি দিতে চায় না, নিদেনপক্ষে লাল মারুতি গাড়ি
মভার্ন দ্রৌপদী কেন বলে না—আমি তোমার,
তাহোলে তো পা টিপতে চাইলে বলতাম
আমার কপাল টেপো লক্ষ্মীসোনা।
কিন্তু ঐযে বল্লাম—এসব আমার হবার নয়,
আমার গাড়ি নেই, বাড়ি নেই, নারী নেই
আমার জন্য বরাদ্দ দু' প্যাকেট থিন এরারুট বিস্কুট।

কোভালাম—১৯৯৩ / রথীন কর

পাথরের গায়ে পাথর
উঁচু শিলাস্তরে ভেঙে পড়ে
বেহিসেবী ঢেউ, এমন সারাদিন সোহাগী
ঢেউ খেতেছে লুকোচুরি খেলায়
সারিবদ্ধ ভ্রমণার্থী আসে যায়
হুটোপাটি করে
তীর ছুঁই জল নিয়ে হুটোপাটি
কে রাখবে বালিতে ভবিষ্যের দাগ।

ওদিকে বিদেশিনীর রৌদ্রস্নান
নামমাত্র পোষাকে চোখের বিলাস
ব্যস্ত নারিকেলবীথি হাওয়া দেয়
সবুজ গাছেরা নাড়া দেয়
ঝুসঝুসের অলিন্দে
ঢেউ ভেঙে যায়
ঢেউ ভাঙে
ঢেউ মিশে যায় ঢেউয়ের সমুদ্রে

বাতিঘরে আলো জ্বলে
অস্তমান সোনা রং রেকাবির
দ্যুতি আকাশে
আন্দোলিত স্বর্ণরেখাজলে

সূর্য ডোবে কোভালাম বালুবেলায়।

শতবর্ষের প্রণাম / শঙ্কর বাগ

শতবর্ষ আগে
জন্মেছিল যে শিশু
মায়াবী নৈসর্গের পথ
প্রসারিল বাহু মেলি।
শৈশবের স্নিগ্ধ ভাবমূর্তি
অকপট সারল্য
ফুলের পাপড়ির মতো
মেলে ধরে চারিপাশ।
পাশ্চাত্য ঢেউ-এর সংঘাতে
বিক্ষুব্ধ প্রাণকল্লোল

নতুন সমাজ চেতনায়
যখন খণ্ড বিশ্বাসে অস্থির
বিভূতিভূষণ নিয়ে এলো
শান্ত নির্লিপ্ত
লিরিক মন
শিল্পীসত্তার অকৃত্রিম ছবি।
সোনাডাঙার নির্জন মাঠ,
নিশ্চিন্দপুর গ্রামের মেঠো পথ
শুলঞ্চ বন লতার চুলুনি
সবুজ গাছের টাটকা সুঘ্রাণ।
দিগন্তে সান্ধ্য সূর্যের রক্তচ্ছটা
নীলাকাশে অগণ্য জ্যোতির্লোক
বিচিত্র পুষ্প সম্ভার
নিঃসঙ্গ অরণ্যের অন্তর্বেদনা।
প্রতিদিনের চেনা পৃথিবী
সৃষ্টি প্রবাহের গভীর রহস্য
জীবন-জিজ্ঞাসায় উদ্ভাসিত
অপরূপ শিল্প-চেতনায়।
যান্ত্রিক সভ্যতার অন্তরালে
যুদ্ধ-দুর্ভিক্ষ-মহামারী
ক্ষয়িষ্ণু মানব জীবনের
হৃদয়হীন যন্ত্রণার ছবি
সংবেদনশীল শিল্পীর
মানব-প্রেমী কারাবীণায়
বাণীবদ্ধ আনন্দ বেদনার সুর
স্মরণে-মননে আজও বাজে,
সত্যদ্রষ্টা মহাপ্রাণ
তোমার কীর্তির স্তম্ভে
নির্মল প্রভাতে জানাই
শতবর্ষের অনিন্দ্য প্রণাম।

মেঘপূর্ণিমা / শান্ত রায়

এতো মেঘ কেন এই পূর্ণিমা তিথিতে।
পূর্ণ চাঁদের সঙ্গে নির্জনে নিভৃতে
বসা যাবে, কিছু কথা হবে। অবিরাম
মনের আনন্দ আর প্রাণের আরাম
ঠিক কী রকম? শান্তি হয় কি আত্মার।
আমি তা জানি না, চাঁদ, তোমার বার্তার
অপেক্ষায় ছিনু। আমরা ঢাকা পড়ে আছি
অনাচারে ব্যভিচারে; কভু কানামাছি
খেলি ঈর্ষা অহংকারে মেতে, তেতে উঠে
অন্যকে চুরমার করি, কাঁদি মাথা কুটে,
কেন? কোন্ ব্যর্থতায়?—ভাবি কি কখনো
নিজেকে নিজের পাশে দাঁড় করিয়ে। কোনো
কোনো রাতে তোমাকে অনেক প্রশ্ন করি—
তুমি সব পাপমুক্ত, দেখে যদি মরি।

বিধুর দেখা / অজিত বসু

আবার সেই দৃশ্য
যে-দৃশ্যে বহুকাল আগে ছিলাম আমি।
আমারই আলো থেকে রশ্মি প্রতিফলন
আমারই চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে।

একদিকে মুখ ফিরিয়ে কাল,
অন্যদিকে সটান উজ্জ্বল;
আমাকে সরিয়ে রেখে
আমারই ফেলে-আসা উড়ন্ত পাতাকে
সবুজ ক'রে নতুন গল্প লিখছে।

চলে যাবার পথে
বিধুর এই দেখা আমার
একা একা।

জঙ্গল-২ / দুলাল সমাদ্দার

জঙ্গল। জঙ্গল॥
সেই সবুজ উচ্ছ্বাস তোর কোথা গেল?
কোন কুবে খাওয়া ইঁদুরের পেট
এতখানি হরিৎ-পাচক?
অভিমানী শামুকের খোল থেকে
বের হয়ে আয়; জেগে ওঠ্
অক্সিজেন পিপাসার্ত পাজরের হাড়ে।
একবিংশ শতাব্দীর যান্ত্রিক পুতুল
ভেঙে গেলে টুকরো টুকরো হয়ে
ভেঙে ফ্যাল ম্যাজিক চোখুপি;
তারপর সবুজ ক্ষুধায়
দমন্ত গোলক মাখ্ আয়ক লালায়।

আবার অ্যামিবা থেকে
শুরু হোক অস্থির ভ্রমণ
শুরু হোক গাছ-মানুষ পৌরাণিক গাথা।
তখন নতুন করে—
মানুষের সংস্কারের ভ্রূণে
সহাবস্থানের চুক্তি সাক্ষরিত হোক।

শীতের শহরে লোকটা / শিবনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

হয়তো বা কোথাও আছে চাঁদ অট্টালিকার আড়ালে
এখনো অগণিত জনস্রোত সব বয়সের
এখনো রাস্তায় রয়েছে শহর, থাকবে আরো কিছু সময়
সকলেই ফিরে যাবে ঘরে, কেউ বা উজ্জ্বল প্রকাশ্য রাস্তায়
কেউ বা অনুর্বর অন্ধকার কানাগলিতে।

ঘন হিম ঝরে মাথার উপর।
বাতাসে কাঁকড়ার কামড়।

একটা গাছের নিচে বেঞ্চিতে বসে
লোকটা তাকিয়ে তাকিয়ে ছাখে
এইসব মন্দির প্রাণ সংগোপন উৎস থেকে
উমরভোর উৎসবের নাগরদোলায় চড়ছে
আশা-নিরাশার আলোয় অন্ধকারে
দূর দূর বন্দরের পথে বাণিজ্য তরীর মতো
দুলছে, টলছে এবং থামছে।

লোকটা একটু নড়ে বসে
বরফের মতো ঠাণ্ডা নীরেট চোখ
একটা সিগারেট জ্বালিয়ে একরাশ ধোঁয়া ছেড়ে
নির্ভার ঔৎসুক্যে ছাখে অন্তর ভেঙে
চলমান সব মানুষের চোখে শীতের মরা জ্যোৎস্না।

চুম্বন / সিদ্ধার্থ মুখোপাধ্যায়

অতি সন্তর্পণে, তার ওষ্ঠ ছুঁয়েছি
নখ-অভিমুখ ছিল উর্ধে
আঙুলেতে ভরা ছিল আঙুলের বিষ
যদিও দখলে ছিল মূর্ধা।

আঙুলেই ভরা ছিল আঙুলের বিষ
নখ বেয়ে হয়নি তা ক্ষরা
করতলে অবিরল বর্ণিকা-ভঙ্গ ;
অর্পিত তার মুখ-স্বর্গ—

কপালেতে কাটা দাগ, চূর্ণিত কুন্তল
অর্ধেক নিমীলিত চক্ষু ;
ব্রণকূপে জলপান সমাপন অন্তে
পৌঁছেছি সম্মত লক্ষ্যে।

শক্তি / অচিন্ত্য বিশ্বাস

মানচিত্রে ভালো করে দেখো এই ভূখণ্ড
দারিদ্র্য যাকে ছেঁটে দিয়েছে মাথায় মাথায়
কান থেকে গড়িয়ে গেছে পেতলের অলঙ্কার
মেঘের মতো রঙ সবুজ চেউ খেলে যাচ্ছে ওড়নায়
বুটিদার এক ফাগুয়ার বর্ণালী সৌন্দর্য
রোদে পোড়া পাহাড়ের ঢালে
আজো শীর্ণ উটের মতো হাঁপায়

যে ঐতিহাসিক যুদ্ধপর্বে এখানে হেঁটে এসেছে
ভিস্তিওলা আর সেবাব্রতী মালিনীর দল
আপৎকালে পরাজিত সৈন্যদের জন্য বিতরণ করছে
জল আর রুটি
রুটি আর ঝর্ণা-ঝরা জল
তাদের এখনো খুঁজে পাই—

কে কেড়ে নিতে চায় আমার এই
ফাগুয়ার রংবাহার নাচুনে মেয়ের মতো
সুন্দর স্বদেশ
কে ?
কে পাচার করতে চাও যাবতীয় শস্যদানা
যা তৈরি করেছে এদেশের দীন দরিদ্র কৃষাণ
কে ?
কে খুন করতে চাও ঐ ভিস্তিওলা আর
সেবাব্রতী মালিনীদের
কে ?

দেখো আমি সমস্ত যন্ত্রণার মরু পার হবার জন্য
হেঁটে যাচ্ছি শীর্ণ উটের মতো—আজো
সঙ্গে তপস্যার মতো উদাসীন জীবন-জিজ্ঞাসা
সনাতন প্রশ্ন আর প্রশান্ত উত্তর মালায় মেশা

আমাদের
অপার সৌন্দর্য—

যাকে ভারতবর্ষ ছাড়া কেউ কোনোদিন
উপলব্ধি করে নি।

তুমি কি করে জানবে আমার শক্তি কোথায় ?

পিলে, ক্যাপ-শূলে / বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়

জ্যৈষ্ঠের আর্তব রোদে খুটিদায় বুনেছি ধানবীজ
আহারে আষাঢ় হবে, ধর্মযুদ্ধ, বীর্যখেলা হবে—
আকুল চোখের তারা, এই বোধে ডুবিয়ে ভিজিয়ে,
ছড়েছি বীজের মতো দূরদর্শী অজ্ঞানের দিকে।

ষাঁড়টি নেমেছে পালে, পাল খেতে বকনার কী সুখ ! জানুক।
আর্তব রোদের স্রোতে ভেজে যাক কুমারী কাকাল—
বকনাটি গাভিন হবে, গাই হবে স্তনের মৌচাকে,
শিবলিঙ্গ-মানুষের তৃষ্ণা যাবে বৈশাখী-ধারায়।

মানুষেরা এইসব নিয়মের অঙ্ক ভালো জানে।
স্বাভাবিক ভুল কম, ইচ্ছে করে ভুল করে বেশি,
ভুল শিরোধার্য তবু গোঁজামিলে মেলায় উত্তর—
এইসব মানুষেরা মুক্তকণ্ঠ বপন জানে না।

ঔংস-অসুর মরে রক্ষিনীর পিলে, তীব্র হলে—
শুক্রাচার্য হত হয় রুদ্রের শাণিত ক্যাপ-শূলে।

ক্লান্তির কবিতা, অক্লান্ত / অনুপকুমার আচার্য

যেখানে এখন বাস—
ব্যথার মতো পলাশ
ফোটে, কাল মধুমাস
বিষাদে আছি রে, ভাই।

নদীতে গতির চর
নীলিমাও ভঙ্গুর
জানি না কি অতঃপর—
ভাবছি, কোথায় যাই।

মানুষ চিনেছি রণে
মানুষ চিনেছি বনে
মানুষ চিনেছি মনে ?
অক্লান্ত আছি, ভাই।

জননী-গাছ/অমিয়কুমার সেনগুপ্ত

গাছের সঙ্গম নেই, পারজম্ ফুলের পরাগ
প্রতিটি কোষের পরে এঁকে রাখে প্রজন্মের দাগ—
গাছ তা কি জানে ?—
ফুটন্ত ফুলের বুকে প্রজাপতি কিসের সন্ধানে
সৈনিকের মতো ছুটে আসে ?
অনাগত জীবনের প্রতিবিম্ব গাছের সকাশে
সন্তানের জন্ম চায়। কোন্ গাছ তা হলে জননী ?
আমাকে বুঝিয়ে বলো কোন্ গাছ পুরুষ ? রমণী
কোন্ গাছ ? যৌবনের বন্যতায় কার অরায়ুতে
জন্ম নেয় মহীরুহ ? আন্দোলিত বুকে ও বাহুতে
গাছ কি মায়ের মতো অপত্য স্নেহের ভারে তাকে
জড়িয়ে আদর করে, নাকি পুত্র-কন্যা বলে ডাকে ?

নিরঞ্জন বিলাস-এর কবিতা

অথঃ কিম্

ছিলাম আমি থাকব না,
তাই বলে কি কিছু ভাবব না ?
যত জল্পনা আর কল্পনা
বলল "আমরা অল্প না,
তুমি মরবে, আমরা মরব না।"

কলকাতায়

মোড়ে মোড়ে যান জট,
ঘরে ঘরে চট্ পট্
পৌঁছিয়ে শ্মশানে পুড়ে হ'ব ছাই ;
কলকাতার রাস্তায় সে উপায়ও নাই।

তোমার ওষ্ঠ লালিমা
রূপ লাবণ্য
যৌবন সুষমা
অর্থহীন আমার চোখে
অনেক নারীর খুনী নজর
খুন হয়ে শুধু দেখো
সবাই আমার বুকে ॥

জ্বর / অমলেন্দু দত্ত

ঘরোয়া-খিলানে জমা সাত-পুরুষের ক্ষয়রোগ
সাত কেন—আরো বেশি,
মান্ধাতার আমলের জ্বর···

চন্দ্রকান্ত গোবর্ধন থেকে পরাণ-হারাণ-হরিমতী
জানদা-মানদা সব
এ-ভিটের জন্মেছে বেড়েছে, তারপর দিনগত পাপক্ষয় শেষে
যে-যার মতন চলে গেছে।

শোক ছিল স্মৃতি ছিল দেয়ালে বাঁধানো ছিল ফটো
সেসব এখন ফিকে, ঝাওসায় ভাঁৎসেঁতে, লোনা।
হৃদয়-অলিন্দে কিংবা
মস্তিষ্কের কক্ষে কক্ষে বেধড়ক ঘুং।

ঘর তবু খালি ছিল, খালি আছে—একথা বলিনা।
কেউ এসে রঙ কিংবা পলেস্তারা ফেরায় পাল্টায়
নীরেন-শীতাংশু-জয়া-সুকন্যা-ফাকলি-দেবাঞ্জন
কথাকলি-পূরণ রীমিতা····
আসলে তো যা-হবার হয়
প্রকৃতি না বদলালেও বদলে গেছে মানুষের চোখ।

বাইরে ভিতরে ধ্বস। খসে পড়ছে ঝরে পড়ছে
ভেঙে যাচ্ছে সব। ঠেকা দেওয়া
মিছে জানি, তবু ঠেকা দিই··· ।

দেখি বা না-দেখি রোজ-ই
ঘুরে ঘুরে সারটুকু খেয়ে যায় নিষ্কলুষ ঘুং।

আমার নিজস্ব বৃত্তে/অজন মজুমদার

নিজস্ব বৃত্তে সীমাবদ্ধ হয়ে
গোলক ধাঁধার মতো
পরিধি পেরিয়ে আমি
বেরিয়ে আসতে চাই
অথচ, রোজই আমি
কোন না কোন ভুল করে বসি
এবং পরিধির সীমারেখাতেই
নিজেকে হারিয়ে আমি
নিজেকে খুঁজতে থাকি
আমার নিজস্ব বৃত্তে।

কাজির বিচার

শক্তিত্বলাল দত্ত

ঘটনাটা ১৯৯৬ সালের মাঝামাঝি। এর বছরখানেক আগে বদলী হয়ে এখানে এসেছি—উড়িষ্যার কোল ঘেসে দাঁতন। স্বাধীনতার ১৭ বৎসর পর ১৯৬৪ সালে ব্রিটিশ সৃষ্ট ইউনিয়ন বোর্ডের জায়গায় পশ্চিমবঙ্গে প্রথম পঞ্চায়ত গঠিত হয়—৪ স্তরের পঞ্চায়ত। বর্ত্তমানে ত্রিস্তর। বর্ত্তমানে যা গ্রাম পঞ্চায়ত নির্বাচন ক্ষেত্র তা তখন ছিল গ্রাম পঞ্চায়ত (গ্রামসভা), এখনকার গ্রাম পঞ্চায়ত ছিল তখনকার অঞ্চল পঞ্চায়ত। বর্ত্তমান পঞ্চায়ত সমিতির নাম তখন ছিল "আঞ্চলিক পরিষদ"। জিলা পরিষদের নাম জিলা পরিষদই ছিল। অবশ্য ১৯৭৮ সালের আগে আর এগুলির কোন নির্বাচন হয়নি বা এখনকার মত গ্রামোন্নয়নের কোন দায়িত্বও দেওয়া হয়নি। আমার কাজ ছিল গ্রাম পঞ্চায়ত ও অঞ্চল পঞ্চায়তের কাজের তদারকি ও বাৎসরিক হিসাব পরীক্ষা করা।

এখানে তালদা নামে এক অঞ্চলের প্রধান ছিলেন প্রৌঢ় ভূপেন দত্ত। বয়স ৬০-৬৫ হবে। চিরকুমার, স্বাধীনতা সংগ্রামী, বহুবার জেল খেটেছেন, অল্পশিক্ষিত, কিন্তু ভীষণ একরোখা, স্পষ্ট বক্তা, সহজ, সরল, সৎ মানুষ। জীবন সংগ্রামের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জেনেছেন, শিখেছেন অনেক। কেবলমাত্র যা শিখতে পারেন নি তা হল রাজনৈতিক বা সাংসারিক মার প্যাঁচ। নিজে বিয়ে করেন নি। কিন্তু ছোট ভাই এর সংসার আছে। তাই পৈত্রিক বাড়ী এবং বিষয় সম্পত্তির অধিকাংশ ছোট ভাইকে দিয়েছেন। নিজের যেটুকু ছিল তা একার পক্ষে যথেষ্ট। নিজের জন্য একটা দু'কামরার মাটির কোঠাবাড়ী করে নিয়েছিলেন, কখনও ভায়ের কাছে খেতেন, আবার কখনও নিজে রান্না করে। সামনের ঢাকা দালান ছিল ওনার অঞ্চল অফিস। তখনকার দিনে অধিকাংশ অঞ্চল অফিস প্রধানের বাড়ীতে হোত।

আমি ২৩-২৪ বৎসরের টগবগে যুবক, জীবনে অনভিজ্ঞ এবং একই রকম একরোখা। কিভাবে জানি না দু'জনে-দু'জনের প্রতি আকর্ষিত হয়েছিলাম। বড় ভাল লাগত ওনার সহজ, সরল, অনাড়ম্বর জীবন যাত্রা, আর মানুষের প্রতি অসীম মমত্ববোধ। প্রত্যেক সরকারের দায়িত্ব থাকে অন্ধ, খঞ্জ নিঃস্ব, রিক্তদের দেখ ভাল করার, ওদের জি. আর. (ডোল) দেওয়া হয়। এখন অবশ্য জি. আর.

ছাড়াও বার্ধক্যভাতা, বিধবা ভাতা, কৃষক ও যন্ত্রজীবীভাতা, প্রতিবন্ধীভাতা চালু হয়েছে। এখন জি. আর বাবদ প্রত্যেক প্রাপককে মাসে ১৬ কেজি গম দেওয়া হয়। কিন্তু তখন নগদে মাসে ১ টাকা ১০ আনা দেওয়া হোত। জি. আর. প্রাপকরা মাসে একবার অফলে এসে মাষ্টাররোলে টিপ দিয়ে ঐ টাকা নিয়ে যেত। এরা অশক্ত, নিঃস্ব, রিক্ত বলে সবার অনুকম্পার পাত্র ছিল। সকালে এসে ৫-৭ ঘন্টা অপেক্ষা করে ঐ টাকা পেত।

ভুপেনবাবু প্রধান হয়ে বল্লেন অন্ধ, খঞ্জ, আতুর এরা অফলে আসবে কেন? এদের বাড়ীতে বাড়ীতে এটা পাঠাতে হবে। অফলের সেক্রেটারী বেঁকে দাঁড়াল— এত খুচরো টাকা নিয়ে সারা অফল ঘুরে বাড়ী বাড়ী জি. আর. বিলি করতে পারব না, ভুপেন বাবু নিজে ক্যাম্বিসের ব্যাগে খুচরো টাকা নিয়ে ছাতার আগায় ব্যাগ নিয়ে কাঁধে ঝুলে ঝমঝম আওয়াজ তুলতে তুলতে সারা অফলে বাড়ী বাড়ী অন্ধ, খঞ্জ আতুরদের জি. আর. দিয়ে বেড়াতেন। অবশ্য বেশী দিন ব্যবস্থা চালু রাখতে পারেন নি, সহকর্মীদের চাপে কিংবা দলীয় নেতাদের পরামর্শে।

আমি নতুন সরকারী চাকুরিতে ঢুকেছি। নিয়ম কানুন প্রায় কিছুই জানি না, তার সঙ্গে অনভিজ্ঞতা তো আছেই, কিন্তু সরকারী অফিসারতো, অজ্ঞানতাকে মাটবাট দিয়ে ঢেকে রাখতাম, ভুলভাল ব্যাখ্যা করে যখন তখন প্রধানদের পরামর্শ দিতাম এটা করতে হবে, ওটা করা চলবে না। তবুও জানি না কেন ভুপেনবাবু আমাকে খুব স্নেহ করতেন। আমি অফলে গেলে আমাকে ছাড়তে চাইতেন না। আমার মত অনভিজ্ঞ ব্যক্তির অভিভাবকত্ব প্রায়ই মেনে নিতেন।

প্রায়ই শোনাতেন স্বাধীনতা সংগ্রামের দিনের রোমাঞ্চকর ঘটনা। ওনার কাছেই জেনেছিলাম ভোজপুরী পুলিশের মজার কাহিনী। রাত্রে কার্ফিউ-এর সময় এরাই পাহারায় থাকত, এদের বলে দেওয়া হয়েছিল ১৫-৩০ বয়সী ছেলেদের রাত্রে পেলেই ধরতে হবে। রাত্রে রাজনৈতিক কাজকর্ম চালাতে গিয়ে খুব বিপদ, দেখতে পেলেই বন্দুক উচিয়ে হল্ট করাবে। তারপর প্রশ্ন রাত্রে কেন বেরিয়েছো, উদ্দেশ্য কিতনা? কারণ যাইহোক বয়স ১৫-৩০ হলেই ধরবে। আর বয়স হিসাব করত পন্দরা, বিশ, পচিশ, ত্রিশ। ভুপেনবাবুরা তাই রাত্রে বেরিয়ে ধরা পড়লে বলতেন ডাক্তারের কাছে যাচ্ছি। উদ্দেশ্য ১৯ কি ২৩। ওরা হিসেব করত পন্দরা, বিশ, পচিশ, ত্রিশ, মিলছেনা দেখে ছেড়ে দিত।

জেলে থাকার সময় চটের থেকেও মোটা হাফ্‌প্যান্ট আর ফতুয়া পরতে দিত, গরমে খুব কষ্ট হোত, প্রতিবাদ জানিয়ে অনশন করে কোন লাভ হয়নি। অনশন করলে চেপে ধরে নাকে নল দিয়ে খাইয়ে দিত। ভূপেনবাবু আর তাঁর সঙ্গীরা তাই ধরলেন এক অনন্ত পন্থা। প্রতি রবিবার জেলে জামা কাপড় কাচতে হোত। ওঁরা সারাদিন ধরে পাথরে আছড়ে আছড়ে জামা প্যান্ট কাঁচতেন যতক্ষণ না ফুটিফাটা হোত। তারপর ওগুলি যখন পরতেন তখন প্রায় উলঙ্গ অবস্থা। ঐরকম কয়েকবার হবার পর জামা প্যান্টের কোয়ালিটি বদল হয়েছিল।

ওনার সর্বক্ষণের সঙ্গী ওনার চেয়ে ততোধিক বৃদ্ধ চৌকিদার সুরেন।

ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের অদ্ভুত সৃষ্টি এই "চৌকিদার"। উপনিবেশিক স্বার্থে প্রথমে খুব পরিকল্পিতভাবে এদেশের গ্রামীণ স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থা এবং অর্থনীতির মৌল ভিত্তিকে নষ্ট করা হয়। পরে সাম্রাজ্যবাদী শাসন ও শোষণ বহাল রাখার জন্য স্বায়ত্বশাসন ব্যবস্থার (তাঁবেদার) পুনরুজ্জীবন ঘটানোর প্রয়োজন দেখা দেয়। ১৭৮৩ থেকে ১৮৫৭ পর্য্যন্ত একের পর এক বিদ্রোহ ঘটে। বিদ্রোহ দমনে ব্রিটিশদের দরকার হয় তাঁবেদার ও দেশীয় রক্ষী-বাহিনী। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তৈরী হয় ১৮৭০ সালের "বেঙ্গল চৌকিদারী এ্যাকট", ১০-১২ বর্গ মাইল যায়গা নিয়ে তৈরী হয় "ইউনিয়ন বোর্ড"। জেলাশাসক স্থানীয় মনোনয়ন দিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দেন চৌকিদার, দফাদার। খরচ পত্র স্থানীয় কর বসিয়ে তোলা হোত। দাস যুগে দাসদের যে ইতিহাস পাওয়া যায় তাতে মনে হয় না মানসিক দিক থেকে তারা চৌকিদার দফাদারদের থেকে বেশী দাসমনোভাবাপন্ন ছিল। এই থানার চোখ কান। থানার জমাদার, হাবিলদার, ছোটবাবু, মেজবাবু, বড়বাবু সবার মন যুগিয়ে সবার জন্য বেগার খাটতে, কাঠ চিরে দিতে, ইউনিয়ন বাবুদের বাজার করতে, বাগান কোপাতে, কাঠ ফাটা রোদে ৮-১০ মাইল হেঁটে খবর আদান প্রদান করতে, রাত্রে প্রহরে প্রহরে হুঁসিয়ার বলে গৃহস্থকে সজাগ রাখতে, এবং সবার দাঁত খিচুনি খাবার জন্য মুখ বুজে সদা প্রস্তুত থাকত চৌকিদার দফাদার।

যখনই অকলে যেতাম ভূপেনবাবু প্রায়ই আটকাতেন। বহুদিন রাত্রে ওনার কাছে থেকেছি। সুরেন চৌকিদার জাল দিয়ে মাছ ধরত, না হলে মুরগী কাটত। আর ভূপেনবাবু রান্না করতেন। বহুদিনই ঝালঝুন হয়ে বেশী হয়ে যেত না হলে ঝোল কম হতো, কিন্তু ভূপেনবাবুর আন্তরিকতার ছিয়েনে তৈরী খাবার আমার অন্ততঃ খারাপ লাগত না।

আমি বিভিন্ন জনের কাছে ভূপেনবাবুর সততার কথা, সারল্যের কথা, মমত্বের কথা বলতাম, এর জন্য আমার ঘনিষ্টজনেরা ঠাট্টা করে আমাকে বলত ভূপেনবাবুর "ইলেকশন এজেন্ট"।

একদিন অফিসে একটা দরখাস্ত হাতে এল, দরখাস্তটা পড়ে আমি হতবাক। ভূপেনবাবুর সর্বক্ষণের সঙ্গী সুরেন চৌকিদার টিপ সই দিয়ে দরখাস্তে বলেছে প্রধান সাহেব আমাকে টিপ সই করিয়ে নিয়ে আমার ১ বছরের মাহিনা বাবদ পাওনা ৪৮ টাকা দেন নি। হুজুর টাকা আদায়ের ব্যবস্থা করে দিন। ঐ সময়ে চৌকিদারেরা সরকার থেকে পেত মাসে ৬ টাকা এবং অঞ্চল থেকে ৪ টাকা। দরখাস্তটা পড়ে যতটাই হতবাক ততটাই সংকুচিত এবং উত্তেজিত হয়ে পড়লাম। মনে হল ভূপেনবাবু আমার সংগে বেইমানি করেছেন, অদ্ভুত মানসিক অবস্থা—ক্রুদ্ধ, অসহায়, আহত।

সারারাত অসহ্য যন্ত্রণায় কাটল, "বিশ্বাস" চূর্ণ হয়ে যাবার যে এত যন্ত্রণা তা ঐ প্রথম অনুভব করলাম।

আমার অফিস থেকে তালদা অঞ্চল পঞ্চায়ত অফিস প্রায় ১০ মাইল দূরে। ভোর বেলায় তদন্ত করতে রওনা হলাম, অঞ্চল অফিসের কাছে পৌছে দেখি ভূপেনবাবু অফিসে বসে হুঁকায় তামাক খাচ্ছেন আর তাঁর পায়ের কাছে রামভক্ত হনুমানের মত সুরেন চৌকিদার বসে কথা বলছে। আমি আমার উপস্থিতি না জানিয়ে একটু এগিয়ে গিয়ে পাশ থেকে বোঝার চেষ্টা করলাম কি নিয়ে কথা হচ্ছে। আমার মনে হয়েছিল দরখাস্ত করার কথা জানতে পেরে ভূপেনবাবু হয়ত সুরেনকে বকাঝকা করছেন, হয়ত দরখাস্ত তুলে নেবার জন্য চাপ দিচ্ছেন। কিন্তু হতাশ হলাম—অভিযুক্ত আর অভিযোক্তা তাদের অতীত দিনের খোশগল্পে মত্ত, একটু বিহ্বলভাবে অঞ্চল অফিসে ঢুকে পড়লাম।

ভূপেনবাবু হৈ হৈ করে অভ্যর্থনা জানালেন। দরাজ গলায় বল্লেন সুরেন বাড়ীর ভেতরে জলখাবারের কথা বলে পুকুরে জাল দে। আমি কণ্ঠস্বরে যতটা সম্ভব তিক্ততা মিশিয়ে বল্লাম, ওসব পরে হবে। আমি যে কাজে এসেছি আগে সেই কাজটি সারি তারপর অন্য কথা। আমি স্বপ্নেও ভাবিনি আপনি এমন লোক, সামান্য ৪৮ টাকার লোভ সামলাতে পারলেন না?

এই বলে ওনার ব্যথিত, বিস্মিত দৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সুরেনকে বাইরে ডেকে

একটু দূরে নিয়ে গেলাম। দরখাস্ত বার করে পড়ে শুনিয়ে বললাম—তুমি এই দরখাস্ত করেছ?

সুরেন বল্ল—হ্যা বাবু। কেন করেছো? কি করব, প্রধানবাবু যে কিছুতেই আমার টাকা দিতে চাচ্ছেন না। বলছেন দিয়ে দিয়েছি। আমি সুরেনকে প্রশ্ন করলাম—আচ্ছা উনি তোমায় ৬৮ টাকা মেরে দিলেন, এর আগেও কি এইভাবে তোমার বা অন্য চৌকিদারের টাকা মেরেছেন? সুরেন জিব কেটে বল্ল, ছিঃ বাবু দেবতার মত মানুষ, উনি কখনও গরীবের টাকা মারেন। বুড়ো হয়েছেন, উনি ভুলে গেছেন। এ আবার কি গেরো? ওকে বোঝানোর চেষ্টা করি যে এভাবে বলে তোমার টাকা আদায় করা যাবে না বা ওনাকে ঠকাবার জন্য শাস্তি দেওয়া যাবে না। তোমাকে পরিষ্কার করে বলতে হবে উনি তোমাকে ঠকিয়েছেন। সুরেন কেঁদে অস্থির। আমি বুড়ো বয়সে ঐরকম দেবতার মত মানুষের নামে মিথ্যা বলে নরকে যাব? আমার টাকার দরকার নেই। মহা ফাসাদে পড়লাম, খুবই চিন্তায় পড়ে গেলাম, আমি যদি সুরেনের এই Statement note করে ফিরে যাই তাহলে সবাই ধরে নেবে আমি ভূপেনবাবুর প্রতি দুর্বলতাবশতঃ তাঁকে বাঁচানোর জন্য চৌকিদারকে চাপ দিয়ে এরকম লিখিয়েছি। সুরেনকে ওখানে অপেক্ষা করতে বলে অফল অফিসে ফিরে গেলাম।

ভূপেনবাবুকে দরখাস্তটা দিয়ে বল্লাম পড়ুন এবং আপনার কি বলার আছে বলুন। উনি দরখাস্তটা পড়েই রেগে আগুন হয়ে গেলেন। সুরেন সুরেন বলে চিৎকার করে ডাক পাড়লেন।

আমি ক্রুদ্ধস্বরে বল্লাম ওকে এখন ডাকবেন না। আগে আপনার কি বলার আছে বলুন। তারপর ওকে আমি ডাকব। উনি ক্রুদ্ধস্বরে বল্লেন আমি টাকা দিয়ে দিয়েছি। চৌকিদারের সামান্য টাকা মারার জন্য আমি দশবছর জেল খাটিনি। তারপর হঠাৎ খুব বিষণ্ণ কণ্ঠে বল্লেন বিশ্বাস করুন মানুষকে ভালবেসে, দেশকে ভালবেসে জেল খেটেছি। বিহ্বলতা ক্রমশঃ বেড়েই চলছে। কি করব বুঝতে পারছি না।

হঠাৎই প্রশ্নটা করে ফেলাম—সুরেন কি টাকা পেয়েও আবার ঠকিয়ে টাকা নিতে চাইছে? সংগে সংগে উত্তর—ছিঃ ছিঃ ওকি ঐ রকম মানুষ, বড়ো হয়েছে তাই টাকা নিয়ে ভুলে গেছে। এতো মহা যন্ত্রণায় পড়া গেল। অভিযোক্তা বলছে অভিযুক্ত দেবতা—বুড়ো হয়েছে তাই ভুলে গেছে। আর অভিযুক্ত বলছে অভিযোক্তা কি ঠকাবার মানুষ—ও বুড়ো হয়েছে তাই ভুলে গেছে।

এবারে আমি যা করলাম—জানিনা ঐ মুহূর্তে কোন কাজি সাহেব আমার উপর ভর করেছিলেন কিনা—তা পুরানো দিনের কাজি সাহেবরাই করতেন শুনেছি।

আমি গম্ভীরভাবে বল্লাম—ভূপেনবাবু সুরেনের ৪৮ টাকা দিয়ে দিন। —না দোব না—আমি ওকে টাকা দিয়ে দিয়েছি। —তবুও দেবেন কারণ ভুল একজন কারো নিশ্চয়ই হয়েছে। সুরেন গরীব তার তুলনায় আপনার অবস্থা ভাল। যদি সুরেন ভুল করে থাকে এবং আবার ৪৮ টাকা বেশী নেয় আপনার খুব ক্ষতি হবে না, কিন্তু যদি আপনার ভুলে সুরেনের ৪৮ টাকা যায় তাহলে ওর কত ক্ষতি হবে একবার ভেবে দেখুন।

জানিনা উনি কি বুঝলেন—সংগে সংগে ৪৮ টাকা সুরেনকে দিয়ে দিলেন।

পরবর্তী কালে এই ঘটনার কোন প্রতিফলন সুরেন কিংবা ভূপেনবাবু কারও আচরণের মধ্যে দেখতে পাইনি।

একই রকম সরল ও স্বাভাবিক। এরপর আরো ১ বছর ঐ এলাকায় ছিলাম, নানাভাবে খোঁজ নিতাম ভুলটা কার। আমি আজও বুঝতে পারিনি ভুলটা কার—সুরেনের না ভূপেনবাবুর।

আমার হারেম

প্রতাপকুমার রায়

হারেম শুনেই পাঠককুল চমকে উঠবেন না। আমার হারেম ও নবাব-বাদশার হারেমে আসমান জমিনের ফারাক। নবাব-বাদশার হারেমে থাকে বিবিজানের দল; আমার হারেমেও থাকে বি, বি, মানে বেস্ট বুকস অর্থাৎ বাছাই করা বই। আমি এক বই-পাগল লোক। পাগলের মত বই পড়ি আর পাগলের মত কিনি। বই খুব ভালবাসি। বইকে কত ভালবাসি একথাটা বোঝাতে গেলে বলতে হয় বৌ-এর ভালবাসার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। তাই তো আমার বেটার-হাফ্ বইগুলোকে সতীন আখ্যা দিয়েছেন। দেবেনই না বা কেন। গভীর রাত অবধি বই-এর কাছে পড়ে থাকলে বৌ-এর রাগ হওয়া স্বাভাবিক। তবে আমার স্ত্রী বইরূপী-সতীনকে ভালও বাসেন। কারণ তিনি নিজেও বই পড়তে ভালবাসেন। আর বইরূপী প্রেমিকাদের কিভাবে সংগ্রহ ও আবদ্ধ করলাম হারেমে অর্থাৎ আমার নিজস্ব গ্রন্থাগারে সে কথাই ব্যক্ত করার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা।

যতগুলো ভাল অভ্যেস আছে বই কেনা তাদের মধ্যে অন্যতম। আর হবি বলতে আমরা যা বুঝি, বই কেনাটাকে সে পর্যায়ে নিয়ে যেতে পারলে তো কথাই নেই। যদিও এই হবিটা ব্যয়সাপেক্ষ। তবে অন্যান্য হবি যেমন দেশ-বিদেশ ভ্রমণ, বাগান করা, ঘর সাজাতেও টাকার প্রয়োজন হয় প্রচুর। তবে নিজস্ব গ্রন্থাগার করতে হলে বই কেনাটাকে হবিতে পরিণত করতেই হবে, নতুবা ভাল সংগ্রহের একটা গ্রন্থাগার এক মনুষ্যজীবনে সম্ভব নয়। কোন কোন রাজনীতিক পত্রিকার প্রচারের জন্য যেমন বলা হয় অমুক পত্রিকা পড়ুন ও পড়ান। বই সংগ্রহের বেলায় এই নীতি প্রথমেই বর্জনীয়। কারণ বই অন্যের হাতে গেলে ফিরে আসে কম আর ফিরে এলেও পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে না। কথায় বলে বৌ আর বই হাত পাল্টালে পুরনো অবস্থায় ফেরে না।

প্রয়োজনে বই কেনা আর বই কেনা হবির মধ্যে পার্থক্য আছে। বই কেনা যার হবি, সে সুযোগ পেলেই যাবে কলেজস্ট্রীটের বই বাজারে, হাতে টাকা থাকুক আর না থাকুক। টাকার জোগান থাকলে তো কথাই নেই, পছন্দ মত বই কিনবে। বই কেনা যার হবি তার প্রতিমাসের বাজেট ফেল হবেই। পছন্দ মত বই হাতের কাছে আছে আর টাকার অভাবে সে বই কেনা হবে না—তা হতে পারে না। দরকার হলে ধার করে টাকা এনে বই কিনে নেবে। হাতে টাকা না

থাকলেও বই-পাগলদের বই বাজারে ঘুরতে দেখা যায়। বই কিনতে না পারলেও বই নাড়াচাড়া করে, বই-এর গন্ধে মনকে তৃপ্ত করে। এরকম বই-পাগলদের বই বাজারের প্রায় সকলেই চেনেন। আমি এই রকমের এক বই পাগল। আমার পাগলামির ধকল সহ্য করেছেন কলেজস্ট্রীটের অনেক প্রকাশক। আমাকেও কখন কখন পুরনো পছন্দসই বই বেশী দামে কিনতে হয়েছে পুরনো বই-এর দোকানে। কারণ ওরা জানে বই পছন্দ হলে আমি কিনবই, দামের জন্য আটকাবে না। আর তাই আমাদের রুচিমাফিক বইও জোগাড় করে রাখে ওরা।

একটা উদাহরণ দিলে বুঝতে সুবিধা হবে বই পাগলদের বই কত প্রিয়। প্রত্যেক পুরুষ ও নারী যৌবনে পদার্পণ করে। তাই কোন যুবক যদি কোন সুন্দরী যুবতীর প্রেমে পড়ে, তখন যুবকটি হয় দিশেহারা। সে চায় প্রেমিকা তার কাছে সব সময় থাকুক। অথচ যুবতীর পক্ষে সম্ভব নয় প্রেমিকের এই আশা পূরণ করা। কারণ দিনের বেলায় বেশিরভাগ সময় কাটে কলেজে ও রাতের বেশিরভাগ সময় কাটে বাড়িতে। তাই চোখের দেখা দেখতে হলে কলেজের বা বাড়ির আশেপাশে ঘোরাঘুরি করতে হবে প্রেমিকের। বই পাগল ক্রেতার অবস্থাও হয় ঐ প্রেমিকের মত। তবে প্রেমিকের থাকে একটি প্রেমিকা, আর বই পাগলের প্রেমিকা হয় অনেক। কারণ যে বইটিই পছন্দ হয় সেটিই সে সংগ্রহ করে। আমার অবস্থাটাও হয়েছে ঠিক প্রেমিক-প্রেমিকার মতো। প্রেমিকার মুখ দর্শন না করলে যেমন প্রেমিকের সময় কাটে না, তেমনি সুযোগ পেলেই আমিও বই বাজারে যাই বইরূপী প্রেমিকার খোঁজে। এ দোকানে সে দোকানে ঘুরে বেড়াই প্রেমিকার সন্ধানে।

প্রতি বছর বই প্রেমিকদের জন্য 'পশ্চিমবঙ্গ গ্রন্থমেলা' ও 'কলিকাতা পুস্তক-মেলা' এই দুটি মেলার আয়োজন করা হয় মহা সমারোহে। এ যেন স্বয়ম্বর সভা বই প্রেমিকদের। তফাৎ এটুকু যে স্বয়ম্বর সভায় নায়িকা তার পছন্দমতো বরের গলায় মাল্য দান করে। এখানে প্রেমিক প্রেমিকাকে বেছে নেয় তার রং, রূপ, আকৃতি ও গুণ বিচার করে। একদিন আসে যখন প্রেমিক প্রেমিকার স্বপ্ন সফল হয়। তারা আবদ্ধ হয় পরিণয় সূত্রে। দুজনে দুজনকে পায় পরিপূর্ণ রূপে। হারাবার ভয় থাকে না। আর প্রেমিকার মুখদর্শনের জন্য এখানে ওখানে দৌড়-ঝাঁপ করতে হয় না। মন প্রাণ ভরে একে অপরকে দেখে ও প্রেম নিবেদন করে।

বই প্রেমিকদেরও ঐ একই অবস্থা হয় যখন তার নিজস্ব গ্রন্থাগার হয়। অনেক

প্রেমিকাদের কাছে পেয়ে মন তার ভরে যায়। কিন্তু পরিপূর্ণ হয় না। প্রেমিক-প্রেমিকা একে অপরকে পেয়ে পরিতৃপ্ত হয় কিন্তু বই প্রেমিকেরা তার নিজস্ব গ্রন্থাগার হওয়া সত্ত্বেও নতুন প্রেমিকার খোঁজে বই পাড়ায় যায়। আমি আমার বইরূপী প্রেমিকাদের আবদ্ধ করেছি কাঁচে ঘেরা আলমারিতে। এটাই আমার হারেম। প্রাণ ভরে প্রেমরস পান করি বই-এর প্রতি পাতা থেকে। কোন জায়গায় অনেক সুন্দরীর সমাগম হলে যেমন অনেকেরই দৃষ্টি সেদিকে পড়ে, তেমনি পছন্দসই ভাল বই-র সংগ্রহ দেখলে অনেকেরই মন ছুঁক ছুঁক করে। সুন্দরী বৌ থাকলে যেমন অনেকেই ভাব জমাবার চেষ্টা করে তেমনি ভাল ভাল বই দেখেও অনেকেরই লোভ হয়। কাছে আসে। অনেক ক্ষেত্রে সুন্দরী রমণীর রূপ লাবণ্যে মোহিত হয়ে সুযোগ বুঝে অনেকে বিশ্বাসঘাতকতাও করে। বই-এর ক্ষেত্রেও হয় একই ব্যাপার কখনও কখনও। পছন্দসই কোন বই নিয়ে অনেকে ফেরত দেয় না। আশ্রয় নেয় মিথ্যার, করে বিশ্বাসঘাতকতা! আমি এদিক থেকে প্রথম থেকেই সতর্ক। প্রথম প্রথম আলমারীর গায়ে লেবেল এঁটে রাখতাম "বই চাহিয়া লজ্জা দিবেন না"। এখন আর কাউকে কিছু বলতেও হয় না। কেউ বই চায় না।

সুন্দরী ঘরণী থাকলে ঘরের শ্রীবৃদ্ধির সাথে সাথে অন্যের ঈর্ষার পাত্রও হতে হয়। অনেক সময় অনেক বাজে কথাও শুনতে হয় বিশ্বাসযোগ্য না হলেও। তেমনি নিজস্ব গ্রন্থাগারে ভাল বই এর সংগ্রহ থাকলেও অন্যের ঈর্ষার পাত্র হতে হয়। অনেক প্রয়োচনামূলক কটূক্তি মুখ বুজে সহ্য করতে হয়। আমাকেও সহ্য করতে হয়েছে অনেক বাজে কথা।

বই কেনা শুরু করিয়েছিলেন আমাদের দুলাল দা। তখন আমি মহাকরণে করণিকের কাজ করতাম। শ্রীদুলাল মুখার্জী আমাদের সিনিয়র ছিলেন। এখন তিনিও মহাকরণে নেই। কিন্তু যে ভাল অভ্যেসটা তিনি শুরু করিয়েছিলেন তা আজও বজায় আছে। এরপরে উৎসাহ পেয়েছি সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় পুস্তকের সমালোচনা পড়ে। আনন্দবাজার পত্রিকার রবিবাসরীয়ের পুস্তক পরিচয় আমাকে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত করে নতুন বই কেনার।

আর একটা কথা না বললে বই-এর সব কথা বলা হবে না। বই মানুষের পরমবন্ধু। মানুষরূপী বন্ধুর চেয়েও বড়। কারণ মানুষবন্ধু বিশ্বাসঘাতকতা করে কিন্তু বই পড়ে মানুষের উপকার ছাড়া অপকার হয়নি। তাছাড়া বই এর আর একটা গুণ হল মানুষের চরিত্র গঠন। যে বাড়িতে বই সংগ্রহ করার অভ্যেস আছে, সে বাড়ির ছেলে মেয়েদের মধ্যে পড়াশুনা করার একটা পরিবেশ গড়ে ওঠে,

পড়াশুনা করার এক অভ্যেস তৈরী হয়। আর একবার পড়াশুনার ভেতর ঢুকে পড়লে সেখান থেকে বেরোনো মুশকিল অর্থাৎ ছেলে মেয়েদের খারাপ হওয়ার সম্ভাবনা প্রায়ই থাকে না। পাঠ্য পুস্তক ছাড়া বাইরের বই পড়ার অভ্যেস গড়লে জ্ঞানের পরিধি উত্তোরোত্তর বাড়তেই থাকে, কমে না। আর সব চাইতে মজার ব্যাপার হ'ল জ্ঞান বাড়লে কমার কোন সম্ভাবনা নেই। যেমন একবার সাঁতার শিখলে ইচ্ছে করেও কেউ ভুলতে পারে না।

নবাব-বাদশার হারেমে যেমন বহুরূপের বেগম দেখা যায় আমার হারেমেও তেমনি নানান স্বাদের বই আছে। গল্প, উপন্যাস, কবিতার বই-এর চেয়েও বেশি আছে প্রবন্ধের বই। আবার প্রবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্র বিষয়ক প্রবন্ধের বই সর্বাধিক।

বই সংগ্রহ করা যত কঠিন তাকে ঠিক মত রক্ষণাবেক্ষণ করা মনে হয় আরও কঠিন। ঠিকমত লক্ষ্য না রাখলে স্ত্রীরত্নটির শরীরের অবনতি যেমন অনিবার্য তেমনি ঠিকমত দেখভাল না করলে বই কীট দ্বারা আক্রান্ত হবেই। স্ত্রীরত্নটি যত আপনই হোক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হ'লে যেমন এক শয্যায় শয়ন নিষিদ্ধ তেমনি যত ভাল বইই হোক কীটবিদ্ধ হ'লে সেই বইটি অন্যান্য ভাল বই থেকে আলাদা করতেই হবে। নতুবা একে একে সকল ভাল বই কীটের কবলে পড়বে। রোগাক্রান্ত স্ত্রীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা বজায় রাখলে যেমন স্বামীও সেই রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়।

রোগ সারাতে যেমন স্ত্রীকে স্বাস্থ্যকর জায়গায় পাঠাবার প্রয়োজন হয় তেমনি মাঝে মাঝে বইগুলিরও হাওয়া বদলের প্রয়োজন আছে। সেটা অবশ্য বাড়ির বারান্দায় বা ছাদে রোদে দিলেই হবে। অসুখের ক্ষেত্রে যেমন ওষুধ ও পথ্য দুই-ই চাই তেমনি বই এর ক্ষেত্রে রোদ ও হাওয়া খাদ্যের কাজ করলেও বেগন-স্প্রেরূপী ওষুধের প্রয়োজন হয় মাঝে মাঝে। তবেই বইগুলি দীর্ঘায়ু লাভ করবে। আর নিজস্ব গ্রন্থাগার অটুট রাখতে হলে বই বাড়ীর চার দেওয়ালের বাইরে যেতে দেওয়া নিষিদ্ধ। তবে অনুসন্ধানমূলক কোন কাজে মদত অবশ্যই করা উচিত বই দিয়ে, তবে হিসেব রেখে। একটা বই ফেরত দিলে তবেই দ্বিতীয় বই দিতে হবে। নতুবা নৈব নৈব চ। আমার গ্রন্থাগারের বই ব্যবহার করে কয়েকজন গুণী ব্যক্তি উপকৃত হয়েছেন এতে আমি ধন্য ও আমার গ্রন্থাগার করাও সার্থক। আমার হারেমে আমার বিবিজানদের নিয়ে আমি তৃপ্ত। তৃপ্ত হবারই কথা, কারণ হারেমে বিবিজানদের সংখ্যা তো কম হোল না। নবাব সিরাজউদ্দৌলাও হার মেনে যাবেন ; কেন না নবাবের হারেমে তিন হাজারের উপর বিবি ছিল কিনা সন্দেহ।

কবিতা, কবিতার কাহাকাহি

আধি ও আনন : হরপ্রসাদ সাহু । বাক্‌প্রতিমা, মেদিনীপুর । পাঁচ টাকা ।

এখন কবিতা নয় : অশোক বাহা । প্রাইমা পাবলিকেশন্‌স্, কলিকাতা-৭ পনেরো টাকা ।

অন্তরাগের আলো : নিরঞ্জন বিশ্বাস । ময়না প্রকাশনী, কলকাতা-৭০০০০৯ । পঁচিশ টাকা ।

মাঠ ফুরোলে : হিমাংশু জানা । পাবলিক প্রেস, হাওড়া । তিন টাকা ।

মন ও মননের কাছে ততোখানি না হলেও, দৃষ্টির কাছে, হরপ্রসাদ সাহু বেশ পরিচিত নাম—চেনা-অচেনা একাধিক কবিতাপত্রের সৌজন্যে। মাত্র বিশটি কবিতার আলোচ্য কাব্য-পুস্তিকাটি কিন্তু ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য সীমারেখা পেরিয়ে কিছু সুস্পষ্ট প্রতিশ্রুতি রেখে যায়—হৃদয়ের কাছেও। অস্তিত্বের সংকটে বিপন্ন কবি শুধু মুখ নয়, গোটা অস্তিত্বকেই খুঁজতে চেয়েছেন যেন। অশ্রুজলে স্বপ্ন ভিজে যায়, পৃথিবী মায়া ও প্রণয় হারিয়ে যায়, দূরে সরে যায় আরো অনেককিছু ; তবু, হারানো অঙ্গুরী খুঁজে পেতে ঘুমে জাগরণে মেতে ওঠেন। অকৃত্রিম স্বরে উচ্চারণ করতে পারেন, 'আখো, সমস্ত আকর্ষ দিয়ে ধরেছি তোমার দু' চোখ, / থেকে যাবো কিছু-কাল, এই জলে এই আলোয়, একাকী।' আপাত মৃদু কণ্ঠে অস্তিত্বের সদর্থক কিছু চিহ্ন ফুটে থাকে তাঁর কবিতায়। তথাপি, প্রথানিষ্ঠ এই কবির কাছে 'তবুও' শব্দটি অনভিপ্রেত মনে হয় না ?

অশোক বাহা 'এখন কবিতা নয়' বলে আমাদের প্রস্তুত রেখেও, কয়েকটি যথার্থ কবিতাই উপহার দেন। 'মৃত্যু, একটু অপেক্ষা করতে হবে', 'কল্লোলিনী' যতোটা আলোকিত করে, অন্যেরা ততোটা নয়। তার কারণ হতে পারে, জীবনের সমূহ অভিজ্ঞতা প্রকাশে তিনি যে রকম উন্মুখ, অভিজ্ঞতাকে দার্শনিকতার মোড়ক দিতে যতোটা তৎপর, কবিতার সাজসজ্জা, অবগুণ্ঠন নির্মাণে ততোটা নন। বরং উদাসীনই যেন কিছুটা। 'প্রজাপতি আজকাল তুমিও তাদের দালাল ?'—এরকম পঙ্‌ক্তি নির্মাতার ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন ওঠে না। কিছুটা হতাশা জন্ম দেয় বরং, 'অসংলগ্ন মনের ফাটল / চিন্তায় কেবিকল জুড়তে পারে না (সবারই এখন হয়)'—অতীব বাক্‌বিন্যাস। নিশ্চিত, অভিন্ন কলমের কথা নয়। হতে পারে, নিরন্তর অনুবাদ চর্চা তাঁর মৌলিক কবিতাকে প্রভাবিত করেছে।

স্বনাম ব্যবহারের চমকে নিরঞ্জন বিলাস এক সময়ের সম্রান্ত গল্পশিল্পী রঞ্জন অথবা এ যুগের অন্যতম জনপ্রিয় কথাকারকে মনে করিয়ে দেন। তাঁর 'অন্তরাগের আলো' কাব্যগ্রন্থটির অসামান্য প্রচ্ছদ এঁকেছেন সুব্রত চৌধুরী। ভূমিকা লিখেছেন ভূলেন্দ্র ভৌমিক। এছাড়া, সূচনায় 'আমার কথা' এবং তৃতীয়-চতুর্থ প্রচ্ছদেও তাঁর কবি ও ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে অনেক তথ্য তিনি আমাদের জানিয়েছেন। তবে কবিতায় তিনি 'ধানিছে', 'নিবেদিল', 'লভি' ইত্যাকার শব্দ ব্যবহার করেছেন অক্লেশে, যা পঞ্চাশ-ষাটের বাংলা কবিতায় দুর্লক্ষ্য। (রচনাকাল অনুযায়ী তাঁর কবিতার যে সময়ের প্রতিনিধিত্ব করার কথা।) এই ধ্বধা-নব্বইয়েও অজস্র ছন্দোবদ্ধ কবিতা থেকে তাঁর কবিতার বক্তব্য সহজ, সরল, একমাত্রিক; জীবন-কালের যন্ত্রণা, ভাষা ও ভঙ্গী থেকে একেবারে স্বতন্ত্র—একথা স্বীকার না ক'রে উপায় নেই। কিছু রচনায় বাঙালী পাঠক শৈশবে পড়া 'খোকার প্রশ্ন' জাতীয় পদ্যের নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত হবেন।

হিমাংশু জানা, ইতোমধ্যেই এই পত্রিকায় আলোচিত নাম। তাঁর এবারের পুস্তিকা 'মাঠ ফুরোলে'কে কবিতা, ছড়া অথবা কবিতার কাছাকাছি—কিভাবে নেবেন পাঠক, জানতে ইচ্ছে করে। নাকি সমকালের অগ্রগণ্য কবির ভাষায় (ভঙ্গী ও ব্যঞ্জনায় নয় নিশ্চিত) 'পদ্য' বলা যাবে এদের? ছাপা ও অঙ্গসজ্জায় মনে হয়, ছোটদের কথা ভেবেই তাঁর এই প্রয়াস। যাই হোক না কেন, শস্যশ্যামল গ্রামবাংলার ছবি তাঁর লেখায় এক কথায় জীবন্ত। মাঠের ফসলের মতোই সতেজ সবুজের ঘ্রাণ টের পাওয়া যায়।

সব ক'টি বই-ই সুমুদ্রিত; ঝকঝকে। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি তো নয়নাভিরাম। তবু, এরই মধ্যে, ছাপাখানার ভূতের দৌরাত্ম্যও নজর এড়ায় না।

অনুপকুমার আচার্য

With best compliments from :

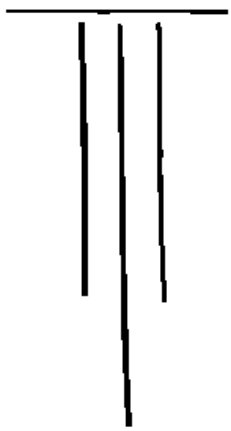

A well-wisher

KRISHANU Vol. XXVI No. II Regd. No.
Quarterly Rs. 2.00 R.N. 16533/68

MENEC-2004

কৃশানু

- 'কৃশানু' মুখ্যত নবীন লেখকদের মুখপত্র। উত্তমানের যে কোন মৌলিক রচনা প্রকাশের জন্য সাদরে গৃহীত হবে। প্রয়োজনীয় ডাক টিকিট সঙ্গে না থাকলে অমনোনীত রচনা ফেরৎ দেওয়া সম্ভব নয়।
- প্রতি সাধারণ সংখ্যার মূল্য দুই টাকা। এককালীন চাঁদা সডাক দশ টাকা। নমুনা সংখ্যার জন্য দুই টাকার ডাক টিকিট পাঠাতে হবে।
- পাঁচজন গ্রাহক সংগ্রহকারী এক বছরের কাগজ বিনামূল্যে পাবেন।
- পাঁচ কপির কম এজেন্সি দেওয়া হয় না। এজেন্টরা ২০% কমিশন পাবেন।
- যাদের গ্রাহক-চাঁদা শেষ হয়েছে, তারা গ্রাহক-চাঁদা পাঠান।

যোগাযোগের ঠিকানা : ৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯

মদন দাশ কর্তৃক ৩০/১এ, কলেজ রো, কলকাতা-৯ থেকে প্রকাশিত এবং নির্মল মুদ্রণ, ৮, ব্রজদুলাল স্ট্রীট, কলকাতা-৬ থেকে মুদ্রিত।